একুশ সাহিত্য-বিনোদন-বিচিত্রা

আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা

চাঁদ সুলতানা মাহবুব কামরুন

''মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা''

৫৬ বৎসর এ ভাষাকে নিয়ে আন্দোলন, আলোড়ন করে করে আজ এ ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষারুপে বিশ্বের দরবারে স্থান পেয়েছে। এটা যে আমাদের কত ত্যাগ তিতিক্ষার সম্পদ তা ভাবতেও গৌরবে বুকটা ভরে যায়। বিবর্তমান পৃথিবী কোথাও এক পলকের জন্য থেমে থাকে না। চলাই তার ধর্ম। কখন কোন মুহুর্তে যে তার চলার গতি থেমে যাবে কেউ জানি না। যাদের নিয়ে তার এ চলা তারা কিন্তু অহর্নিশি পদে পদে, পলে পলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এ ধারা প্রবাহমান চলছে এবং চলবে। তারই রূপ নিয়ে আবার নতুন আঙ্গিকে এই পৃথিবীতে আগমন করছে।

এই বিবর্তনের গতি থেকেই সৃষ্টির সবচেয়ে সেরা জীব মানুষ খুঁজে পায় ইতিহাস। ইতিহাস কথা বলে। ইতিহাস অতীতকে ঘেঁটে ঘেঁটে যোজন যোজন ধরে অপেক্ষায় থেকে নতুন ধারায় অগ্রসর হয় এই বিবর্তনের মাঝে। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে বন থেকে বেড়িয়ে এসেছে। নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরী করেছে সভ্য সমাজ। সমাজ জীবনে মানুষের বিভিন্নমুখী ক্রীড়াকলাপ, উত্থান-পতন ইতিহাস ধরে রাখে। ইতিহাস সংরক্ষণের প্রতিবন্ধকতার কোন অভাব আজ আর নেই। মানুষ অনন্তকাল ধরে সংগ্রাম করে করে এ পর্যায়ে এসেছে। সংগ্রাম করেছে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণে জাতির উন্নতি সাধনে, সংগ্রাম করেছে ভাষাকে বৈপ্লবিক রূপ আনয়নে। এই ভাষার জন্য যুগে যুগে কত নিবেদিত প্রাণ হারিয়ে গেছে।

দুইশত বছর ইংরেজদের শাসনে থেকে ভারতবাসী মুক্তি পেয়েছিলো ১৯৪৭ সনে। সম্প্রদায়ের সুবিধার্থে ভারতবর্ষ দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিলো পাকিস্তান ও ভারত নামে। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অধীনে দিলো। পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা উর্দু। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্র ভাষা উর্দু হবে বলে ঘোষণা দিলো। পূর্ব বাংলার জনগণ বাংলা ভাষায় কথা বলে। জন্মলগ্নে যে মা ডাকে এ পৃথিবীতে এসেছে তাকে ছেড়ে অন্য ভাষায় মা ডাকবে এটাতো হয় না। আলোচনার ঝড় ওঠে পূর্ব বাংলার জনগণের মাঝে। তাদের সাহস আছে কিন্তু শক্তি নাই। প্রতিবাদ করতে গেলে চাকরী হারাতে হবে। নতুবা বুলেট বিদ্ধ হতে হবে। কলেজ ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েদেরতো আর সে ভয় নেই। তাদের তরুণ রক্ত টগবগিয়ে ওঠে।

''মানবোনা মানবোনা কোন বাধাই
মানবো না
রুটির বদলে ভাত চাই, রাষ্ট্র ভাষা
বাংলা চাই।''

এই শ্লোগানে তারা বেড়িয়ে পরে বাংলার অলিতে, গলিতে, রাজপথে। ১৯৫২ সনে প্রথম ভাষা আন্দোলনে প্রাণ হারায় সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার আরো নাম না জানা অগণিত বাংলা মায়ের আদরের দুলালেরা। তাদের অনুসারীরা বছরের পর বছর প্রাণ দিয়েছে এ ভাষার জন্য। তারা আজ সবাই শহীদ। তাদের স্মরণে নির্মিত হয়েছে শহীদ মিনার। প্রথম যারা মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলো সে তারিখটি ছিলো ১৯৫২ সনের ২১ ফেব্রুয়ারী।

প্রতি বছর তাই এই দিনটিকে স্মরণ করে বাংলা মায়ের আবাল, বৃদ্ধ বণিতারা। বিবর্তনের সৌভাগ্যে আজ সারা গ্লোবালে বাঙালি ছড়িয়ে আছে। সে সুবাদে বাংলা ভাষাও স্থান পেয়েছে আন্তর্জাতিক ভাষারুপে বিশ্বের দরবারে। বিভিন্ন মিডিয়াগুলিও খুব সুন্দরভাবে ২১ ফেব্রুয়ারী উদযাপন করছে। আমরা শুধু বছরে একবার পুষ্প অর্ঘ্যের মাধ্যমে তাদেরকে স্মরণ করবো না, তাদের জন্য আমরা প্রতিদিনের প্রতিটি প্রার্থনায় দোওয়া করবো।

বাংলাদেশের পানি সমস্যার সমাধানে বেঙ্গল বেসিন

একুশ প্রতিবেদন:

প্রবাসী বাংলাদেশী শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী ও গবেষক ডঃ রাসবিহারী ঘোষ বলেন যে, বুড়িগঙ্গার দুষিত পানি পানের জন্য আগামী ১০/২০ বছর পর উক্ত এলাকার তরুণী মায়েরা সন্তান ধারণে অক্ষম হয়ে পড়বে অথবা বিকলাংক শিশুর জন্ম দিবে। সম্প্রতি লস এঞ্জেলেসে একুশ পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন যে, বাংলাদেশের পানির সমস্যার প্রতি যদি আমরা নজর না দেই, তাহলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর কারণে-দেশের অধিকাংশ ভূমি তলিয়ে যাবে। সানফ্রান্সিসকোতে বসবাসরত বাংলাদেশীরা বিশ (২০) বছর পূর্বে ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব বেঙ্গল বেসিন (আইআইবিএস) প্রতিষ্ঠা করেন, যার উপদেষ্টা হিসাবে রয়েছের চার জন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। তিনি বাংলাদেশের পানি সমস্যা নিয়ে বিগত ২০০২ সনের পহেলা জুনে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন ক্রাইমস এগেইনস্ট হিউম্যানিটির উপর বেঙ্গল বেসিন একটি সম্মেলন করেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে তিনি আইআইবিএস এবং ইউনিভার্সিটি ক্যালিফোর্ণিয়া, বার্কলির পাবলিক হেলথ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে বেঙ্গল বেসিনের পরিবেশ এবং ইকোলজিক্যাল ইস্যুর উপর প্রস্তাবিত প্রকল্প পেশ করেন। তিনি বিশ্বের জন্য মডেল হিসাবে হিমালয়কে সর্ব্বোচতা এবং বে অব বেঙ্গলকে সর্বনিম্ন হিসাবে বেঙ্গল বেসিন দেখিয়েছেন। তিনি বলেন, ইকোলজিক্যাল মডেল হিসাবে বেঙ্গল বেসিন একটি ইউনিক, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের সমস্যাকে তুলে ধরতে পারি। পানিকে গ্রাউন্ডের মধ্যে ইনজেক্ট করে দিয়ে পারি, তলদেশ থেকে জমাকৃত টক্সিক বা দূষিত ক্যামিক্যালস ধৌত করে বে অব বেঙ্গলে পাঠিয়ে দিতে পারি।

ডঃ রাসবিহারী ঘোষ জগন্নাথ কলেজের প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন। এরপর লন্ডনের ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটিতে সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির এসোসিয়েট প্রফেসর ছিলেন। তিনি একজন সিনিয়র টেকনিক্যাল সায়েন্টিস্ট, ক্যালিফোর্ণিয়ার এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সীর। তিনি বলেন, বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ। বড়, মাঝারি নিয়ে সর্বমোট ২৫০টি নদী দেশময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। নদীই এই এলাকার মানুষের রক্তের জীবন। অতএব, পানির উপর আমাদের কৃষি, অর্থনৈতিক নির্ভরশীল। মাছ প্রোটিনের জন্য প্রধান উৎস, সেখানে যদি পানি সমস্যা বিরাজ করে তাহলে জীবন দুর্বিষহ হতে বাধ্য হবে। তিনি বলেন, ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব বেঙ্গল বেসিন একটি ইউনিক নেটওয়ার্ক, বিশেষ করে স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের জন্য যারা প্রাথমিকভাবে পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তা ভাবনা এবং কাজ করতে চান। বিশেষ করে যারা বেঙ্গল বেসিনের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের খাবার পানি সংরক্ষণের জন্য গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশে আর্সেনিক একটি পানির সমস্যা। বুড়িগঙ্গা নদীর প্রসঙ্গে আলাপকালে বলেন যে, বুড়িগঙ্গা নদী আজ বিশাল আবর্জনায় পরিণত হয়েছে। এই এলাকার মানুষ জীবনের জন্য পান করছে এই সকল পানি যার ফলে মহিলাদের সন্তান ধারণের ক্ষমতা হারাবে অথবা জন্মগতভাবে শিশু বিকলাংকে পরিণত হবে বলে মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে বাংলাদেশ প্রচুর ভূমি হারাবে। এ ব্যাপারে জাতিকে রক্ষার জন্য সচেতনতার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন বিশেষ করে পানির সমস্যা আগামী নতুন প্রজন্মের স্বার্থে সমাধান করা উচিত।

সমস্যার প্রধান অন্তরায় হিসাবে তিনি ভারত এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্রাইসিসকে দায়ী করেন। ব্যক্তিগতভাবে মিঃ রাসবিহারী ঘোষ পশ্চিম বঙ্গের সরকারের সাথে কথা বলেছেন কিন্তু পলিটিক্যাল ক্রাইসিসের জন্য সম্ভবপর হয়নি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রচুর পরিমাণে পানি প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে যা বন্যায় পরিণত হচ্ছে। আমাদের পরিকল্পনা এই সকল স্রোতধারাকে নেপাল এবং পশ্চিম বঙ্গের তলদেশে ইনজেক্ট করে দেওয়া, তার ফলে তলদেশের বিষাক্ত রাসায়নিক ড্রেনের মাধ্যমে প্রচুর পানি ও দুষিত পদার্থের পরিশোধনের ফলে সমস্যার সমাধান হতে বাধ্য হবে এবং আর্সেনিক দূরীভূত হবে বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষের পানি ক্রয় করে খাওয়ার ক্ষমতা সকলের নেই। সেক্ষেত্রে বেঙ্গল বেসিন প্রকল্পের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলের মানুষ বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করার সুযোগ পাবে। ২০০০ - ২০০১ সনে বাংলাদেশ-ভারতের পানি বন্টন চুক্তি প্রসঙ্গে বলেন, ঢাকার বুড়িগঙ্গার পানি আবর্জনায় পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও কলকাতার পানির তুলনায় এখনও পর্যন্ত উন্নত আছে। ডঃ ঘোষ মনে করেন সেদিন বেশী দূরে নয়, তবে সমস্যাহীন দু'দেশের সরকার পক্ষের বিশ্বাস ও বোধগম্যতার অভাব তা বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায়। তিনি আরও বলেন, প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন প্রয়োজন সর্বস্তরে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং এগিয়ে আসা। ৩০০ আমেরিকান বিজ্ঞানী বাংলাদেশের বেঙ্গল বেসিন প্রকল্পের উপর কাজ করার জন্য প্রষ্টুত রয়েছেন। এছাড়া অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশের বহু বিজ্ঞানী হাত বাড়িয়ে রয়েছে বলে জানান।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বেঙ্গল বেসিনের মাধ্যমে সারা বিশ্বে মডেল হিসাবে বাংলাদেশকে পানির সমস্যা অর্থাৎ বন্যার হাত থেকে, নদ-নদী শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে, দুষিত পানিকে পরিশোধনকরন, আর্সেনিক মুক্ত সহ সকল বিষাক্ত রাসায়নিককে ধৌতকরণের মাধ্যমে জাতিকে রক্ষা করা এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে বিলুপ্তের হাত থেকে সীমারেখা রক্ষা করা সম্ভবপর হবে দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেন। বিস্তারিত জানার জন্য ২১টিউব ডট কম-এ (www.21tube.com) গেলে ভিডিও দেখতে পাবেন।

একুশের ভাবনা:

ছাপ্পান্ন বছর আগের একটা বিশাল সত্য সাগরের ঢেউয়ের মতো এসেছিল

মমতাজউদদীন আহমদ

দুনিয়া জুড়ে কোন কিছুই মিথ্যা নয়, অসত্য নয়। সুন্দরবনের বাঘ যেমন সত্য, আবাদী জমিতে কীটপতঙ্গও তেমনই সত্য। কবি বলেন, সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালবাসিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা।

আমাদের নিগৃহীত, বঞ্চিত এবং মোহের নেশায় অন্ধ জীবনে ছাপ্পান্ন বছর আগে একটা বড় সত্য, বিশাল সত্য উন্মত্ত সাগরের ঢেউয়ের মতো এসেছিল। সেই ঢেউয়ের দোলায় আমাদের অনেক ভুল, অনেক অন্ধত্ব কেটে গেছে। ড. শহীদুল্লাহ যেমন বলেছেন আমরা হিন্দু অথবা মুসলমান যেমন সত্য, তারো বড় এক সত্যও আমরা বাঙালি।

ছাপ্পান্ন বছর আগের সেই বিশাল সত্যের ঝাপটায় আমরা জেনেছি, ধর্ম আর কৌশলী বিশ্বাস দিয়ে নয়, দীর্ঘদিনের যাপিত জীবন দিয়ে দেশ আর জাতি গড়ে ওঠে। আমি বাঙালি, তুমি বেলুচি, আমি ইরাকিও তুমি ইংরেজও এই সত্যটি ধর্মের দ্বারা তৈরি হয়নি। দীর্ঘদিনের যাপিত জীবন বোধ নিয়েই জাতি গড়ে উঠেছে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের রাজনীতি আর সমাজ নীতি নিয়ে অথবা কোন ব্যক্তির খেয়ালখুশি দিয়ে জাতি নির্মিত হয়নি, হবেও না।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যে সত্য আমাদের দৃষ্টিতে বিশাল সত্যের মতো ধরা পড়ল, সেটি হল, আমরা বাঙালি। গৌড় সমতট আমার জনপদ, অ আ ক খ আমার প্রিয় বর্ণমালা। নবান্ন পৌষ পার্বণ আমাদের জীবনাচরণ। এই স্থায়ী সনাতন সত্য ভুলে আমরা সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হয়ে ভিন্ন পথে ছুটেছিলাম, কিন্তু বায়ান্নর একুশ এসে আমাদের চলার পথকে সঠিক করে দিল।

একুশ এক অমোঘ সত্য। রক্তরঙিন হয়েছে রাজপথ, তিলে তিলে রক্ত ঝরে মরেছে তরুণ যুবক। মাথার মগজ গড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়ও সেই ত্যাগের বিনিময়ে একুশ আরো ভাস্বর হয়ে সত্যের আলোকে গৌড়বঙ্গকে উদ্ভাসিত করে গেছে।

একুশ মানে এগিয়ে চলা, একুশ মানে শত্রুকে দলে পিশে চলার পথকে মসৃণ করা, একুশ মানে জাগরণের মন্ত্রে উত্থিত হওয়া। সমস্ত সংস্কার, ক্ষুদ্রতা, সাম্প্রদায়িকতা ও আলস্যবিমুখতাকে ছিন্নভিন্ন করে আধুনিক জীবনকে উজ্জ্বল করা মানেই একুশের সত্যকে আরো সমুজ্জ্বল করা।

একুশের সত্য এক বিশাল মহৎ সত্য। পঙ্কিল আবর্ত থেকে, মজে যাওয়া স্রোতহীন জলাধার থেকে উত্থিত হয়ে প্রবল জীবন স্রোতের দোলায় দুলে ওঠা হলো একুশ। একুশ মানে নিজেকে চিনে নেয়া, একুশ মানে নিজের দেশ ও দেশাচারকে ভালবাসা, একুশ মানে নিজের ভাষা ও বর্ণমালাকে হৃদয় রসে স্নাত করা। বাংলার সমুজ্জ্বল পঞ্চাশটি বর্ণমালায় যে দীপ্তি, সেই দীপ্তিকে চিনেছি একুশের সত্য দিয়ে। বাংলা গদ্যের যে ব্যঞ্জনা, বাংলা কবিতায় যে শৈলী তাকেও বুঝেছি একুশের স্বপ্ন দিয়ে। বাংলায় যুক্তাক্ষরের যে নান্দনিক রূপ সেই সত্যকে আবিষ্কার করেছি একুশের সত্য দিয়ে। অর্থাৎ আমার আমাকে তিলে তিলে গড়ে তোলার জন্য একুশের সত্যের মহিমাকে জানা খুব প্রয়োজন ছিল। যারা আমাকে একুশের মহিমা ও সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য রক্তের স্রোতে স্নাত হয়ে মৃত্যুর পরপারে চলে গেছে, তাদের আমি হাজারবার সালাম করিও এখনকার তুমি আর ভবিষ্যতের তুমিও আমরা সকলেই একুশের কাছে ঋণী। আমাদের মতো ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী আর কে হবে।

কখনো কখনো কোন দিন বা তারিখ আর ক্যালেন্ডারের পাতায় সংখ্যা হয়ে থাকে না। সেই সংখ্যা একটি সত্যের মহিমায় জেগে ওঠে। যেমন সাতই মার্চও ১৯৭১ সাল রোববারও যৌবন জলতরঙ্গে উত্থিত হয়ে উচ্চারিত হল এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রামও সেই সংগ্রামে আমরা পথে নামলামও স্বাধীনতা বৃক্ষের ছায়ার জন্য আমাদের যাত্রা শুরু হল। অথবা ১৬ ডিসেম্বরও ১৯৭১ সাল বৃহস্পতিবার, যেদিন বলদর্পী নরপশুদের নতমুখ আত্মসমর্পণ হল আর বিজয় উল্লাসে একটি জাতি জন্ম নিলও সেই দিন আর তারিখ নয়। এক বিশাল নির্মাণ হয়ে গেল।

তেমনি বায়ান্নর একুশ মানে একটি বিশেষ দিন বা তারিখ মাত্র নয়ও একটি সত্যের উত্থানের উদ্ভব হয়ে রইল। যার মহিমায় জগৎজুড়ে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস স্বীকৃত হল। একুশ কেবল বাংলার নয়, বিশ্বের সম্পদ ও মহিমা হয়ে গেল।

818-941-3876

ভাষা তথা মাতৃভাষা

এম, মাহবুব আলী

ভাষা তথা মাতৃভাষা প্রাণির আত্মার মুক্তি ও সাবলীল গতি। এটা প্রাণির জন্মগত অধিকার ও সম্পদ। জীবনের লক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস। প্রাণের লক্ষণ ভাষা। কথায় বলে ঃ জলের অপর নাম জীবন। আমরা আরেকটি বাক্য যোগ করবো, ভাষা তথা মাতৃভাষার আরেক নাম প্রাণ। ভাষা প্রাণানুভূতির লক্ষণ।

যে জাতির নিজস্ব ভাষা নেই সে জাতি মৃত, প্রাণহীন, ইতিহাসে বিলুপ্ত। নির্দিষ্ট ভাষা নির্দিষ্ট জাতীয় সত্ত্বার প্রতীক। জাতীয় ভাষা জাতির প্রাণস্বরূপ, জাতির মুখপত্র, অক্ষয়ী সম্পদ। বাংলা ভাষা বাঙালির প্রাণস্বরূপ, বাঙালির মুখপত্র ও অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদের শেষ নেই। যতই এর অনুশীলন ও ব্যয় ততই এর প্রসার ও প্রগতি। ইংরেজ জাতি পৃথিবীর যেখানেই পদার্পণ করেছে সেখানেই তার মাতৃভাষা সর্বস্তরে চালু রাখতে সচেষ্ট থেকেছে। ইংরেজী ভাষা তাই আজ সর্বজন স্বীকৃত আন্তর্জাতিক ভাষা।

ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতি-কৃষ্টি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-ইতিহাস, শিল্পকলা ইত্যাদির ধারক ও বাহক। গ্রীক সভ্যতার উপকরণ গ্রীক ভাষায়, মিশরীয় সভ্যতা ইতিহাসের উপকরণ মিশরীয় ভাষায়, চীন সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান চৈনিক ভাষায় এবং ইউরোপীয় সভ্যতা-সাহিত্য, শিল্পকলা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ইউরোপীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ। উন্নত জাতি ও উন্নত ভাষা পরস্পর আপেক্ষিক, তেমনি আপেক্ষিক উন্নত ভাষা ও উন্নত সাহিত্য-সংস্কৃতি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি-কৃষ্টি বাঙালির গৌরবের বষ্ট। তুলনামূলকভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এখনও বয়সে নবীন। প্রবীণতা উত্তরণের পূর্বেই চর্চা, অনুশীলন, রচনাশৈলী, শৈল্পিক ও আঙ্গিক গুণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যে পঞ্চম স্থানে অধিষ্ঠিত।

ভাষার কোন সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র নেই। বাধা বিহীন বিচরণ ভাষাকে বলবান করে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ভাষা বিনিময় প্রথা কার্যকর। এক স্তম্ভের উপর কোন অট্টালিকা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, তেমনি কোন ভাষা একক আত্মনির্ভরশীল হতে পারে না। ভাষাকে পরিপুষ্ট, শক্তিশালী, সর্বজনগ্রাহ্য করার জন্য অন্য যে কোন ভাষা থেকে মাত্রা জ্ঞান সহ যথাযথ শব্দ নির্বাচন ও আহরণ অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে আত্মগরিমা ও উন্নাসিকতা অবশ্য পরিত্যাজ্য। কবি নজরুল ইসলাম আরবী, ফারসী, উর্দু, সংস্কৃতি ইত্যাদি শব্দসমূহ ব্যবহার করে বাংলা ভাষার জৌলুস ও অলংকার বৃদ্ধি করেছেন। তিনি শব্দ চয়নে যাদুকর ছিলেন। ইংরেজী ভাষায় ল্যাটিন, ফ্রান্স, গ্রীক, জার্মান, ইটালী ইত্যাদি শব্দ সমূহের অবাধ মিশ্রণ রয়েছে। এর ফলে ইংরেজী ভাষার ভৌগলিক মাত্রা ক্রমবর্ধমান এবং সাহিত্য ও বাণিজ্যিক মূল্য সর্বাধিক। স্পষ্টঃতই নিজ ভাষার কারিগরী বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য অন্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ একান্ত প্রয়োজন।

মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে এক বা একাধিক বিদেশী ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা অত্যধিক এবং এটা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ কারণে পুনরায় উল্লেখ করছি যে, মাতৃভাষার জ্ঞান ভান্ডার বাড়ানোর জন্যে যেমন বিদেশী ভাষার সাহায্য আবশ্যক তেমনি বিদেশী ভাষার ব্যুৎপত্তি লাভের জন্যে মাতৃভাষার মাধ্যম অপরিহার্য। প্রসঙ্গতঃ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বৃটিশ ভারতবর্ষ ও বার্মা দেশের স্কুল সমূহের পরীক্ষাগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গ্রহণ করা হতো। তখন মাত্র দু'টো বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো। ঐ আমলে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্ররা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় নয় বার প্রথম স্থান অধিকার করবার গৌরব অর্জন করেছিল এবং এর মধ্যে একাধিকক্রমে তিন বার প্রথম স্থান পেয়েছিল। লক্ষ্যণীয় ছাত্ররা প্রতিবারই ইংরেজী সাহিত্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেতে সক্ষম হয়েছিলো। সাফল্যের মূলমন্ত্র ঃ শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা বাংলা। ইরেজী পড়াতেন প্রধান শিক্ষক। তিনি বিদেশী ভাষা শিখানোর জন্যে মাতৃভাষা বাংলাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতেন। পরীক্ষায় ভাষার মাধ্যম ছিলো ইংরেজী। শিক্ষার্থীগণ একমাত্র মাতৃভাষার সাহায্যে অনায়াসে বিদেশী ভাষা আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অজান্তেই মাতৃভাষা ক্যামেরার কাজ করে।

ভাষা মানুষের চিন্তাধারার শুধু বাহক নয়, কর্ষণভূমিও বটে। যারা প্রাণিকুলের কল্যাণে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন বা করছেন, তাদের সৃজন শক্তি ও প্রতিফলনের মাধ্যম তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষা।

বাংলার কৃতি সন্তান মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম জীবনে ''Captive Lady'' নামে একখানা ইংরেজী কাব্য উপন্যাস রচনা করেছিলেন। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে তার অগাধ পান্ডিত্য ছিল। ইংরেজ সমাজে লেখক যথেষ্ঠ প্রশংসা ও সুনাম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু উপন্যাসখানি পাঠক সমাজে তদানুরূপ সমাদৃত হয়নি। তৎকালীন বৃটিশ পার্লামেন্টের সভা ও সাহিত্যের সমঝদার জনৈক ব্যক্তি উক্ত উপন্যাসখানি পড়ে মধুসূদনকে বলেছিলেন, ''আপনার গ্রন্থখানিতে উপন্যাসের সব রকম উপকরণ এবং পান্ডিত্যের ছাপ রয়েছে, কিন্তু তাতে প্রাণ নেই। বরং মাতৃভাষায় রচনা করে আপনার প্রতিভার যথাযোগ্য ব্যবহার করুন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আপনার দ্বারা উপকৃত হবে''। সেদিনের ইংরেজী ভক্ত মাইকেল মধুসূদন আজ বাংলার গৌরব কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি বাংলা ভাষায় অমিতাক্ষর ছন্দের জনক ও যাদুকর। মাইকেল মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে এক নব যুগের সৃষ্টি করেছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং আজীবন পাশ্চাত্যবাসী বাংলার স্বনামধন্য ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় পাশ্চাত্য শিশুদের জন্য ইংরেজী ভাষায় অনেকগুলো উপাদেয় শিশু সাহিত্য (Juvenile literature) রচনা করেছিলেন এবং খুব প্রশংসা পেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে বইগুলোর আর পুনর্মুদ্রণ ঘটেনি। কারণ এক এবং স্পষ্ট। একমাত্র বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সৃষ্টির জন্যে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন সে সৃষ্টির ভূমি বাংলা ভাষা এবং ফসল বাংলা সাহিত্য। মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়। দ্বিতীয় ভাষা সৃষ্টির পরিপূরক ও সহায়ক মাত্র।

যোগাযোগের সুব্যবস্থা পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় এনেছে। যোগাযোগের প্রথম ও প্রধান অঙ্গ (Component port or agent) শব্দ (sound) তথা ভাষা (Tongue)। স্পষ্টতই ভাষা যোগাযোগের প্রধান বাহন এবং ভাষাই প্রাণির নিরন্তর সহযাত্রী বা বন্ধু। এক্ষেত্রে প্রবাস জীবনে মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিকতার অভাব অথবা স্বকীয়তার অনুভূতির অভাব দুর্বলতার লক্ষণ। দুর্বলতা করুণার দৃষ্টি আনে মাত্র, বন্ধুত্ব আনে না। অর্থাৎ নিজের ভাষায় সবলতা অর্জন ব্যতিরেকে অন্য ভাষায় সবলতা অর্জন দুরুহ ব্যাপার। প্রতিযোগিতার যুগে যেখানেই এর ব্যতিক্রম ঘটেছে সেখানেই পরাজয় এসেছে। আরেকটু খুলে বলা যাক, বাহির জগতের চাকচিক্যে বা মোহে যাদের নিজস্বতা লোপ পায়, তাদের একূল ওকূল দু'কূলই হারাতে হয়। কাজেই ঘরের বাইরে পা বাড়াবার আগেই একাধিক ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব অর্জন করা প্রায় আদেশের পর্যায়ভুক্ত।

জয় হউক প্রবাসীর আত্মচেতনার। জয় হউক বাংলা ভাষার।

(সুপ্রিয় পাঠক ঃ ১৯৮৫, ফেব্রুয়ারী। জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টা সিটি। কবি ডাঃ মঈনুদ্দিন মুন্সী বাংলা ভাষা অনুশীলনের পক্ষে প্রবাসীদের জন্য একটি বাংলা সাময়িকী প্রকাশ করলেন। তখনই এ প্রবন্ধটির আত্মপ্রকাশ। এ প্রজন্মের প্রবাসীদের মাতৃভাষা চর্চার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর জন্যে এ প্রবন্ধটি পুনঃমুদ্রণ অপরিহার্য বলে অনুভব করছি।- লেখক , ফেব্রুয়ারী ২০০৮)

একুশের অর্ঘ্য

একুশ, কি দেবো তোমাকে!

রেহানা সুলতানা

মা, ভাষা আর দেশের শপথে
ওরা নেমেছিল
কৃষ্ণচূঁড়া ঘেরা রাজপথে
রক্তাক্ত করেছিল জলপথ
অগ্নি অরুণিমার মাঝে
বুকের রক্ত দিয়ে
১৯৫২ সনের ২১ ফেব্রুয়ারী
আটই ফাল্গুনে।
স্বাধীন দেশে মায়ের মুখের ভাষায়
অবলীলায় কথা বলার অধিকার
প্রিয়াকে নিজ ভাষায় প্রিয় নামে ডাকার
মাকে মায়ের নামের নেশায় ডাকার
সমগ্র রাষ্ট্রে ভাষা বাংলা হবার আশায়।

হিজল মাদার পলাশ তমালের গ্রাম হতে
এসেছিল ওরা রাজধানী ঢাকায়।
জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হতে।
উর্দু উর্দু এক আজনবী ভাষা
চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে সর্বত্র।
হাতে হাত ধরে ওরা বলেছিল
রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই।
চিৎকারে সোচ্চারে আকাশ বাতাস অনুরণিত হলো
ভাষার জন্য জাগিয়া উঠেছে প্রাণ।
নগ্ন পদে উন্নত বক্ষে হাতে তাদের
বর্ণমালার প্ল্যাকার্ড।
জীবন বাজী রেখে ওরা চলেছে
রফিক শফিক বরকত কতো নাম।
পৈশাচিকদের গুলিতে হারালো তাদের প্রাণ
রক্তাক্ত করলো বর্ণমালা।
ছিন্ন করল মানচিত্র
সেইখানেই গর্বিত হয় শহীদ মিনার।
শুরু হয় আপামর জনতার শ্রদ্ধার
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দেয়ার।

মাধবপাশার পূর্ণ মাসের
সন্তানসম্ভবা ফাল্গুনে
এসেছে হাতে হালি ডালিয়া আর চন্দ্রমল্লিকা নিয়ে।
ধীরে নগ্নপদে চলছে জনস্রোতে ভীড়ে।
জনতার ঢেউএ ঢেউ এগোচ্ছে।
সম্মুখেই মিনারের লাল সূর্য
স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছে।

হঠাৎ মনে হলো
সব সূর্য রশ্মিই তার শরীরে
আকাশের উজ্জ্বল তারারা চোখে বিচ্ছুরিত করছে।
আত্মজ যেন বলছে মা
আর অন্ধকার গহ্বর নয়।
শরীরে তার পঞ্চাশ হাজার বছরের সৃষ্টির প্রসব যন্ত্রণা।
তবুও ফাল্গুনী ভাবেএইতো মিনার এই তো
মিনারের পাদদেশ
একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে
ও আর কিছুই জানে না।

তাকিয়ে দেখি শহীদ মিনারের
ব্যানার আর পতাকায় আবৃত
চারিদিক। উন্মুক্ত আকাশ
নীচে হাজারো ফুলের বিছানায়
নাড়ীতে আটকে থাকা তার
শিশু সন্তান চিৎকার দিচ্ছে
মা -- মা -- মা --।
ফাল্গুনী তৃপ্তির হাসি নিয়ে
বলছে
পৃথিবীর সর্ব শ্রেষ্ঠ ভালবাসা
সর্ব শ্রেষ্ঠ সন্তান একুশক